বিশেষ সংখ্যা

যা জানা জরুরি

রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে পাওয়া মতামতের বুলেটিন

ইস্যু ২৯ × মঙ্গলবার, ১৫ অক্টোবর ২০১৯

কক্সবাজারে স্থানীয় লোকজন ও রোহিঙ্গা জনগণের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অস্থিরতাই হলো বর্তমানে সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ার মতো একটি বিষয়, বিশেষ করে ২০১৯ সালের আগস্ট এর পর থেকে। বর্তমানে কক্সবাজারের আশ্রয়প্রদানকারী মূল বাসিন্দাদের এই অন্তর্নিহিত আশঙ্কা ও উদ্বেগগুলোকে আরও ভালভাবে বোঝার জন্য, বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন সেপ্টেম্বর, ২০১৯-এ একটি সীমিত পরিসরের অনুসন্ধানী গবেষণা চালায়। আমরা স্থানীয় জনসমাজের পুরুষ ও নারী উভয়ের সঙ্গে, স্থানীয় লোকদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কর্মরত এনজিও কর্মীদের সঙ্গে, এবং কিছু স্থানীয় প্রশাসনের কর্মচারিদের সঙ্গে কথা বলি। এই সমীক্ষাটি ড্যান চার্চ এইড এবং আরও একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে একযোগে চালানো হয়, যারা আমাদের মহেশখালি, টেকনাফ এবং উখিয়ায় আশ্রয়দাতা জনসমাজের বাসিন্দাদের কাছে পৌঁছানোর ব্যাপারে সাহায্য করে। এই প্রবন্ধে ওই অনুসন্ধান থেকে চিহ্নিত অন্তর্নিহিত কারণ ও উদ্বেগগুলোকে সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে।

ভয়, অবিশ্বাস, জনমিতিক পরিবর্তন এবং ভুল তথ্য – স্থানীয় মানুষ ও রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমাগত উত্তেজনা বৃদ্ধির পেছনে কাজ করছে

আমাদের আশঙ্কা যে ওরা হয়তো আমাদের হত্যা করতে পারে

উখিয়া এবং টেকনাফের স্থানীয় জনসমাজগুলোতে একটি স্থানীয় ভবিষ্যদ্বাণী একাধিক প্রজন্ম ধরে প্রচলিত আছে। এটি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর লোকেরা তাদের বাপ-দাদার কাছে শুনেছেন, আর তারা আবার তাদের বাপ-দাদার কাছ থেকে শুনে এসেছেন। জনশ্রুতিটি এইরকম — এমন এক দিন আসবে যখন পুরোনো ফেনী নদীটি মানুষের রক্তে লাল হয়ে যাবে এবং মানুষের কাটা মাথার বন্যা বইবে। এই জনশ্রুতিটির মূল, স্থানীয় জনসমাজের অনেক গভীরে প্রসারিত। আমরা যাদের সাথে কথা বলেছি তাদের অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, ভবিষ্যদ্বাণীর ওই দিনটি আর বেশি দূরে নেই এবং যে মানুষের মাথার বন্যার কথা সেখানে বলা হয়েছে সেগুলো আসলে স্থানীয় জনসমাজের মানুষেরই মাথা হবে। আশ্রয়দাতা জনগোষ্ঠীর নিজেদের জীবনহানির ব্যাপারে প্রবল উৎকণ্ঠা রয়েছে এই ধারণা থেকে যে, রোহিঙ্গা জনগণের বিশ্বাস টেকনাফ ও উখিয়া মূলত রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষদের বাসভূমি ছিল। স্থানীয় মানুষজন জানিয়েছেন, যে সব রোহিঙ্গা জনগণের বিশ্বাস এই অঞ্চল আসলে তাদেরই সেই সকল রোহিঙ্গা জনগণের সাথে স্থানীয় মানুষদের প্রায়ই উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। তারা শুনেছেন যে, কক্সবাজার থেকে রাখাইন পর্যন্ত যে রাস্তা আছে তা নাকি অতীতে 'আরাকান রোড' নামে পরিচিত ছিল; এবং এমন কাহিনীও শুনেছেন যে, রোহিঙ্গা সম্প্রদায় ফেনী জেলার দক্ষিণের অঞ্চল নিজেদের বলে দাবি করার কথা ভাবে। উক্ত জনশ্রুতি আর ভয় এ দুটি মিলিয়ে জনসাধারণ মনে করছেন যে, রোহিঙ্গা শরণার্থীরা স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে তাদের নিজেদের এলাকা থেকে বিতাড়িত করার হুমকিস্বরূপ।

এই অঞ্চলে বিপুল জনমিতিক পরিবর্তনও এখানকার স্থানীয় মানুষজনের মনোবলের ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলছে। স্থানীয় মানুষজন মনে হচ্ছে যে, তারা এখন এ অঞ্চলে সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছেন, এবং রোহিঙ্গা সম্প্রদায় মনে করছেন তারা এখন এই অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ। স্থানীয়রা মনে করেন যে, যদি রোহিঙ্গা সম্প্রদায় চায় তাহলে রোহিঙ্গা জনগণের পক্ষে তাদের আক্রমণ করা ও হত্যা করাটা খুবই সহজ। ২০১৭ সালে তাদের বিপুল পরিমাণে আগমনের বর্ষপূর্তিকে চিহ্নিত করতে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের দ্বারা যে জনসমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল তার কারণে স্থানীয় লোকদের মধ্যে এই ভয় আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

> “আমি মজুর হিসেবে রোহিঙ্গাদের সঙ্গে কাজ করি। দিন কয়েক আগে, তারা আমাকে ওই এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বলে কারণ তারা মনে করে, এখন তারাই ওই অঞ্চলের মালিক।”
>
> – পুরুষ, ৩০+, টেকনাফ

> “আমাদের দেশে, কেউ যদি কোন সমাবেশের আয়োজন করতে চায়, তাদেরকে সরকারের অনুমতি নিতে হয়। সরকারের অনুমতি ছাড়াই এত বড় একটা সমাবেশের আয়োজন কেউ কীভাবে করতে পারে? তাই, তারা যে আমাদের আক্রমণ করবে না এটা আমরা কীভাবে বিশ্বাস করব। এখানে আমাদের জনসংখ্যা মাত্র ৩ লক্ষ, যেখানে ওরা ১৬ লক্ষ। আমরা কি নিজেদের রক্ষা করতে পারব? আমরা এখন এখানে সংখ্যালঘু গোষ্ঠী।”
>
> – পুরুষ, ৩০+, টেকনাফ

> “আগে তারা নিজেরা নিজেদের সাথে মারামারি করত। কিন্তু এখন তারা আমাদের আক্রমণ করছে। আমরা শুনেছি তাদের প্রতিটি বাড়িতেই ছুরি আর বন্দুক আছে।”
>
> – নারী, ১৮-২৯, উখিয়া

বাস্তব উদ্বেগগুলো ঘনীভূত হচ্ছে...

গত দুই বছর ধরে স্থানীয় মানুষজন যে সব বাস্তব উদ্বেগগুলোর ব্যাপারে জানিয়ে আসছেন সেগুলোকে *যা জানা জরুরি*-এর পূর্ববর্তী সংস্করণগুলোতে বেশ ভালোভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমানে মানুষজন যে সমস্যাগুলো তুলে ধরছেন সেগুলোও প্রায় একই রকম, যদিও অনুমান করা যায় যে সম্প্রতি সমস্যাগুলো আরও অবনতির দিকে গেছে। মোটামুটিভাবে, আশ্রয়দাতা জনসমাজ যে বিষয়গুলো নিয়ে সবচেয়ে বেশি উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে সেগুলো হল:

- উপার্জনের সুযোগ কমে যাওয়া
- একাধিক চেক-পোস্টের কারণে চলাফেরার সুযোগ সীমিত হয়ে পড়া
- নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধি
- মোবাইল যোগাযোগের ওপর বিধিনিষেধ
- অতিরিক্ত যানবাহনের কারণে সৃষ্ট যানজট
- অপরাধের হার বৃদ্ধি পাওয়া

জনসাধারণ বলছেন, যেহেতু অনেক দিন ধরে তারা এই সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হচ্ছেন, তাই এগুলো তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং মানসিক জীবনে বিরূপ প্রভাব ফেলেছে।

> “এখন আর আমরা শান্তিতে ঘুমোতে পারি না কারণ ওরা [রোহিঙ্গারা] সব চোর-ডাকাতের দল; আর এখন ওরা আমাদের লোকদের খুন করছে।”
>
> – নারী, ১৮-২৯, উখিয়া

মানুষজন উল্লেখ করেছেন যে, যদিও তারা রোহিঙ্গা জনগণের আগমনের শুরু থেকেই এই সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হয়ে আসছেন, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এই সমস্যাগুলো তীব্র আকার ধারণ করেছে বলে তারা মনে করছেন। উদাহরণস্বরূপ, তারা মনে করেন অপরাধের হার সম্প্রতি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তারা বলেন যে, অপরাধ সংঘটনের এই বৃদ্ধি তারাই সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেন – যেমন হাসপাতালগুলোতে মারামারি করতে গিয়ে আহত হওয়া শরণার্থীদের ভিড় অনেক বেশি এ ধরনের ঘটনা পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে। একাধিক মানুষ উল্লেখ করেছেন যে, তারা মনে করেন যে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের কেউ কেউ এখন 'ভাড়াটে-খুনী' হিসেবে কাজ করছে, তাদের কথায়, স্থানীয় (আশ্রয়দাতা) জনসমাজের লোকেরা তাদের 'কুকর্ম' করানোর জন্য টাকার বিনিময়ে রোহিঙ্গা জনগণকে ভাড়া করছে।

উদ্বেগের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল জাতীয় পরিচয়পত্র পেতে বা ভোটার হিসেবে নিবন্ধন করার ক্ষেত্রে সমস্যা হওয়া। মানুষজন মনে করছেন যে, স্থানীয় লোকদের পক্ষে জাতীয় পরিচয়পত্র পাওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে কারণ স্থানীয় অঞ্চলগুলোতে নিবন্ধন প্রক্রিয়া আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। তারা মনে করেন, তারা যদি তাদের জাতীয় পরিচয়পত্রের (এন.আই.ডি) কার্ড হারিয়ে ফেলেন, তাহলে তাদের বাংলাদেশি নাগরিকত্ব চলে যাবে। তারা জানিয়েছেন যে, তাদের সন্তানদের জন্য এন.আই.ডি কার্ড পেতে তাদের অত্যন্ত সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, যদিও এই কার্ড কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি নথি।

> “আগে এন.আই.ডি পাবার জন্য আমাদের মাত্র চারটি কাগজপত্র দেখাতে হত, কিন্তু এখন আমাদের ২০টিরও বেশি কাগজপত্র দেখাতে হচ্ছে। আর এখন অনলাইন সার্ভারও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তাই, মনে হচ্ছে আমরা যেন বাংলাদেশের নাগরিকই নই।”
>
> – পুরুষ, ৩০+, টেকনাফ

কিছু মানুষ জানিয়েছেন যে, শরণার্থীদের পক্ষে এন.আই.ডি কার্ড পাওয়া অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ হয়ে গেছে কারণ তারা মনে করেন যে স্থানীয় মানুষদের তুলনায় ঘুষ দেয়ার সামর্থ্য রোহিঙ্গা জনগণের অনেক বেশি। স্থানীয় লোকেরা মনে করেন যে, বেশিরভাগ শরণার্থীরাই অ্যাম্ফেটামিন (ইয়াবা) লেনদেনের সাথে যুক্ত এবং তাদের ধারণা শরণার্থীরা এই ব্যবসা থেকে প্রাপ্ত আয়, এবং সেইসাথে তারা বিনামূল্যে যে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী পান; তা থেকে তারা এন.আই.ডি কার্ড ও পাসপোর্ট জোগাড় করা বা ক্যাম্প থেকে পালাতে ঘুষ দেয়ার জন্য প্রচুর টাকা সঞ্চয় করতে পারছেন। এছাড়াও স্থানীয় লোকেরা সেই সব বাংলাদেশি সম্প্রদায়ের মানুষদের সমালোচনা করেছেন যারা শরণার্থীদের এসব বেআইনী কাজ করতে সাহায্য করছেন। তারা বলেছেন যে এইসব অল্প সংখ্যক মানুষ লোভের বশবর্তী হয়ে পুরো সমাজ ও দেশের ক্ষতি করছেন।

> “স্থানীয় বাংলাদেশিদের মধ্যে যারা রোহিঙ্গাদের (বেআইনী কাজকর্ম করতে) সাহায্য করছেন, তারাই হলেন আমাদের প্রধান শত্রু, তারাই আসলে এই সব ঘটনাগুলোর জন্য দায়ী...”
>
> – নারী, ৩০+, উখিয়া

যারা ক্যাম্প থেকে কিছুটা দূরে বসবাস করেন তাদের মধ্যেও উদ্বেগ রয়েছে – কিন্তু এই উদ্বেগ যারা উখিয়া বা টেকনাফে বসবাস করছেন তাদের মতো অতটা প্রবল নয়। প্রাণসংশয়ের ভয় অন্যান্য উপজেলাগুলোতে দেখা যায়নি; যদিও তারা যে সব বাস্তব সমস্যা সম্পর্কে উদ্বেগ তুলে ধরেছেন সেগুলো একইরকম ছিল। উদাহরণস্বরূপ, মহেশখালিতে উদ্বেগসমূহের মধ্যে ছিল সরকার সেই সব খাস জমি (সরকারি জমি যা প্রায়ই স্থানীয় মানুষদের কাছে ছেড়ে দেয়া হয় যাতে তারা বসবাস বা কৃষিকাজ করেন) পুনরুদ্ধারের জন্য পদক্ষেপ নিচ্ছে যেখানে তারা বহু প্রজন্ম ধরে বসবাস করছেন; আর সেই সাথে লবণের মূল্য ব্যাপকভাবে কমে যাওয়া (এই অঞ্চলের অনেকেই লবণ-চাষী)।

আমি এমন কোনও মেয়েকে বিয়ে করব না যে ক্যাম্পে কোনও এনজিও-তে কাজ করে

স্থানীয় জনসাধারণ স্বীকার করেন যে, মানবিক সংস্থাগুলো* রোহিঙ্গা সম্প্রদায়কে প্রচুর সাহায্য করছে আর সেই সাহায্যের প্রয়োজনও রয়েছে। তারা এটাও মনে করেন যে, মানবিক সংস্থাগুলো যদি ক্যাম্পগুলোতে তাদের সহায়তা কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়, তাহলে রোহিঙ্গা জনগণ দ্বারা স্থানীয় মানুষদের ওপর আক্রমণের সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যাবে। তারা এটা বুঝতে পারেন যে, মানবিক সংস্থাগুলো ক্যাম্পগুলোতে পয়ঃনিষ্কাশন, পরিবার-পরিকল্পনা, পরিচ্ছন্নতা এবং অবকাঠামোগত সেবা প্রদান করছে এবং সেই সাথে তারা খাদ্য ও প্রসাধন সামগ্রীর মতো বহু জিনিসপত্রও বিতরণ করছে। কিন্তু কখনো কখনো স্থানীয় মানুষদের মনে হচ্ছে যে, শরণার্থীরা অনেক বেশি সহায়তা পাচ্ছেন। তারা বলছেন যে, স্থানীয় বাজারগুলোতে প্রচুর পরিমাণে ত্রাণসামগ্রী বিক্রি করা হচ্ছে এবং রোহিঙ্গা জনগণ মানুষের বাড়ি-বাড়ি গিয়েও ত্রাণ সামগ্রী বিক্রি করছে, যা থেকে তাদের এই বিশ্বাস জন্মাচ্ছে যে, রোহিঙ্গা শরণার্থীরা তাদের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি জিনিসপত্র পাচ্ছেন। তারা মনে করছেন যে, রোহিঙ্গা জনগণ যেখানে তাদের প্রয়োজনীয় সবকিছু পেয়ে যাচ্ছেন, সেখানে মানবিক সংস্থাগুলো স্থানীয় মানুষদের অবহেলা করছে। স্থানীয় বাংলাদেশি সম্প্রদায়ের মতে, তারাও একই ধরনের সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকারী যা শরণার্থীদের দেওয়া হচ্ছে অথবা, যদি সকলকে সেবা দেওয়া সম্ভব নাও হয়, তাহলে অন্তত স্থানীয় বাংলাদেশিদের মধ্যে যারা দরিদ্র, তাদের সহায়তা দেওয়া উচিত। কিছু মানুষের মতে, ক্রমাগত সহায়তা দেয়া সম্ভব না হলেও, অন্তত প্রতি দুই মাসে একবার মানবিক সংস্থাগুলো সহায়তা দিতে পারে। তারা মনে করেন যে, এটা তাদের আরেকটু সচ্ছলভাবে জীবনযাপন করতে সাহায্য করবে।

গত কয়েক সপ্তাহে এমন মনে হচ্ছে যে স্থানীয় জনসাধারণের কাছে মানবিক সংস্থাগুলোর সুনাম কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো মুসলিমদের ধর্মান্তরিত করে খ্রিষ্টান করার চেষ্টা করছে এবং মানবিক সংস্থার কর্মীরা কাজ দেয়ার বিনিময়ে স্থানীয় মেয়েদের শোষণ করছে এই ধরণের খবর ব্যাপকভাবে শোনা যাচ্ছে। কিছু মানুষ এমন একটি ঘটনার কথাও উল্লেখ করেছেন যেখানে একটি ত্রাণ সংস্থায় কর্মরত এক যুগলকে অবৈধ শারীরিক সম্পর্কের অপরাধে কক্সবাজারের একটি হোটেল থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। যদিও মানুষ মেনে নিয়েছেন যে তারা সেই ঘটনা নিজ চোখে দেখেননি আর তাই সেটা সত্যি সেই বিষয়ে নিশ্চিত নন, তবু তারা জানিয়েছেন যে এমন ঘটনা জনসাধারণের মনে এই ধারণা তৈরি করছে যে মানবিক সংস্থায় কর্মরত নারীদের চরিত্র ভালো নয়। এই ধরনের কাহিনী প্রচার হওয়ার কারণে স্থানীয় কিছু তরুণ ক্যাম্পে কর্মরত নারীদের বিয়ে করতে রাজী হচ্ছেন না।

একজন অংশগ্রহণকারী উল্লেখ করেন যে, সমাজের কাছে ছোট হয়ে যাবেন এই ভয়ে তিনি একটি মানবিক সহায়তা সংস্থায় চাকরির সুযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন। তবে যারা কাজ খুঁজছেন, তারা বলেন যে, একটি কাজ জোগাড় করার জন্য তাদের রীতিমত সংগ্রাম করতে হচ্ছে। তারা বিশ্বাস করেন যে, চাকরি পেতে হলে ঘুষ দিতে হয়; এবং এমনকি যদি তারা ঘুষ দিতে রাজিও হন তাদের চাইতে রোহিঙ্গা জনগণ অধিক পরিমাণে ঘুষ দিতে পারে; কারণ তারা অতিরিক্ত রিলিফ বাইরে বিক্রি করে এবং ক্যাম্পের ভেতরের বাজারে ব্যবসা করে বাড়তি আয় করে। অনেকে বলেন, যদি কেউ চাকরির প্রস্তাব পায় তাহলে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী থেকে তাদের হুমকি দেয়া হয় এবং ক্যাম্পের আশেপাশে ঘেঁষতে নিষেধ করা হয়। তারা আরও বিশ্বাস করেন যে, কোন কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা চায় না যে রোহিঙ্গা শরণার্থীরা ফিরে যাক এবং কোন কোন সংস্থা প্রত্যাবাসনের বিরুদ্ধে কাজ করছে।

> “এনজিওগুলো চাল, ডাল, তেল, সাবান, সবকিছুই দিচ্ছে। আপনি আমাকে বলুন যে তারা রোহিঙ্গাদের কী না দিচ্ছে? একটা পরিবারে যা যা দরকার, তার সবকিছুই দিচ্ছে।”
>
> – নারী, ৩০+, উখিয়া

> “একটি রোহিঙ্গা পরিবারের যা কিছু প্রয়োজন হয় তার সব কিছুই এনজিওগুলো তাদের দিচ্ছে। খাবার-দাবার থেকে শুরু করে আসবাবপত্র পর্যন্ত, সবকিছু। তারা এমনকি রোহিঙ্গা মেয়েদের জন্য ফেয়ার অ্যান্ড লাভলিও [প্রসাধনের ক্রিম] দিচ্ছে।”
>
> – পুরুষ, ৩০+, টেকনাফ

> “একটি পরিবার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এলে পাত্রপক্ষ প্রথমেই জানতে চাইছে যে পাত্রী ক্যাম্পে কাজ করেন কিনা। পাত্রীর ক্যাম্পে কাজ করার ইতিহাস থাকলে পাত্রপক্ষ আর সেই সম্পর্কের দিকে এগুতে চাইছে না। আমি এটা আমার প্রতিবেশীর ক্ষেত্রে ঘটতে দেখেছি।”
>
> – নারী, ৩০+, উখিয়া

* *স্থানীয় জনগোষ্ঠী এনজিও-র কথা বলেছে – কিন্তু তারা এনজিও বলতে জাতিসংঘের সংস্থাগুলোকেও বুঝিয়ে থাকে।*

আমরা ফেসবুকের খবরে বিশ্বাস করি না, কিন্তু...

কীভাবে রোহিঙ্গা সংকট সম্পর্কিত তথ্য পান জানতে চাইলে স্থানীয় লোকজন বলেন যে, ক্যাম্পের আশেপাশে বসবাসরত তাদের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে অথবা ক্যাম্পের ভিতরে বা আশেপাশে যারা ছোটখাট ব্যবসা পরিচালনা করেন তাদের কাছ থেকে তারা এ সম্পর্কে জানতে পারেন। জনসাধারণ বর্ণনা করে যে, স্থানীয় চায়ের দোকানে সন্ধ্যাকালীন চা খেতে খেতে তারা রোহিঙ্গা সংকট-সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, এবং তাদের আলোচনার প্রধান বিষয় হয় রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন, ক্রমবর্ধমান অপরাধ কার্যক্রম এবং সাম্প্রতিক সময়ে ক্যাম্পে অনুষ্ঠিত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বিক্ষোভ।

> “যখন আমরা চায়ের দোকানে বসি, সবাই জানতে চায় রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের অবস্থা কি? তারা কবে ফিরে যাবে?”
>
> – পুরুষ, ৩০+, টেকনাফ

চায়ের দোকান বা অন্যান্য লোকসমাগমস্থানের আলোচনার কেন্দ্রে থাকে মূলত স্থানীয় সংবাদপত্রের তথ্য – এই সব আড্ডার প্রত্যেক পুরুষ সদস্য স্থানীয় সংবাদপত্রের তথ্য উল্লেখ করে তার ওপর বন্ধুবান্ধব ও পরিবারের সদস্যদের সাথে আলোচনা বা তর্ক করেন। তথ্য প্রাপ্তির এই ব্যবস্থায় ফেসবুকেরও একটি কৌতূহলোদ্দীপক ভূমিকা রয়েছে: যদিও প্রায় সকল অংশগ্রহণকারীই বলেছেন যে তারা ফেসবুকে যেসব খবর দেখতে পান তা বিশ্বাস করেন না, কিন্তু (ফেসবুক বা মেসেঞ্জারে) বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সদস্যরা যে সব খবর শেয়ার করেন সেগুলোকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করা হয়। অবশ্য সরাসরি প্রাথমিক উৎস থেকে না পেয়ে যদি তথ্যটি একজন বন্ধুর কাছ থেকে পাওয়া যায়, তবে তথ্যটির বিশ্বাসযোগ্যতা অনেক বেশি হয়।

স্থানীয় নারীদের ক্ষেত্রে, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীই জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত তথ্যের মূল উৎস হিসেবে কাজ করে। নারীরা বলেন, যখন রোহিঙ্গা শরণার্থীরা তাদের রিলিফের দ্রব্যসামগ্রী বিক্রি করার জন্য আসে তখন নিজেদের অবস্থা নিয়ে কথা বলার পাশাপাশি ক্যাম্পে কী ঘটছে সে সম্পর্কেও তারা কথাবার্তা বলে থাকে। কোনো কোনো নারী বলেছেন যে, তারা ফেসবুক থেকেও বিভিন্ন তথ্য দেখে থাকেন।

> “আমরা ফেসবুকের খবরে বিশ্বাস করি না। কিন্তু যখন আমার কোনো বন্ধু বলেন যে, তিনি এই তথ্যটি ফেসবুকে পেয়েছেন তখন আমি সেই তথ্যটি বিশ্বাস করি।”
>
> – নারী, ১৮-২৯, উখিয়া

আমাদের ভাসানচরে যেতে বাধ্য করা হবে...

বেশিরভাগ স্থানীয় মানুষ বিশ্বাস করেন না যে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী মিয়ানমারে ফেরত যাবে। জনসাধারণ বলে যে, তারা এমন কোন কিছু দেখতে পান না যার জন্য রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ফিরে যেতে চাইবে, বিশেষ করে যেহেতু তারা বাংলাদেশে তাদের প্রয়োজনের সবকিছুই পাচ্ছে এবং বিভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে প্রচুর সহায়তা পাচ্ছে। লোকজন আরও উল্লেখ করেছেন যে, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে যে স্বাধীনতা ভোগ করছে, মিয়ানমারে তাদের এই স্বাধীনতা পাওয়ার অধিকার নেই। স্থানীয় লোকজন আরও মনে করেন যে, স্থানীয় আইনকানুন শরণার্থীদের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে না। তারা মনে করেন যে, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে ‘অতিথি’ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে এবং রোহিঙ্গা জনগণ এই মর্যাদার অপব্যবহার করছে। লোকজন আরও বলেছেন যে, স্থানীয় প্রশাসন রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের ওপর আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেক সময় অত্যন্ত শিথিলতা প্রদর্শন করে; বিশেষ করে যখন স্থানীয়রা – উদাহরণস্বরূপ চুরির ব্যাপারে– রোহিঙ্গা জনগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে যান। তারা বলেন যে, অধিকাংশ স্থানীয় প্রশাসন তাদের ‘মানিয়ে চলার’ অনুরোধ করে, কিন্তু অংশগ্রহণকারীরা জানান যে তাদের পক্ষে মানিয়ে চলা প্রায় অসম্ভব কেননা বাংলাদেশে প্রথম আসার পর থেকে এ পর্যন্ত রোহিঙ্গা জনগণ অনেক বদলে গেছে। তারা মনে করে যে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী আরও বেশি আক্রমণাত্মক, উদ্ধত এবং অনিষ্টকর হয়ে উঠেছে। মাদক ব্যবসা এবং উদ্বৃত্ত রিলিফ বিক্রি করার মাধ্যমে শরণার্থীদের সম্পদশালী হয়ে ওঠার কারণে তাদের ভেতর এরকম মনোভাব দেখা যায় যে, যেন তারাই স্থানীয় অঞ্চলগুলোতে সংখ্যাগুরু গোষ্ঠী।

> “শুরুতে আমরা তাদের আশ্রয় দিয়েছি কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তাদের আচরণ বদলে গেছে। এছাড়াও, সময়ের সাথে সাথে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থারও উন্নতি হয়েছে এবং তারা উদ্ধত হয়ে উঠেছে। এসব কারণে আমাদের মধ্যকার সম্পর্ক বদলে গেছে।”
>
> – পুরুষ, ৩০+, টেকনাফ

উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যকার এই আশঙ্কাজনক সম্পর্কের কারণে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কেউ কেউ মনে করছেন যে ভবিষ্যতে তাদেরই ভাসানচরে স্থানান্তর করতে বাধ্য করা হবে। যেহেতু তারা বিশ্বাস করেন না যে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী কোনদিনও মিয়ানমারে ফিরে যাবে তাই তাদের আশঙ্কা যে, কোন একদিন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী তাদের আক্রমণ করবে এবং তাদের ভাসানচরে চলে যেতে বাধ্য করবে।

> “আমরা মনে করি রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বরং আমাদের ভাসানচরে পাঠাবে। এবং আমাদের বাধ্য হয়ে সেখানে যেতে হবে কারণ ১০ লাখ রোহিঙ্গা যদি আমাদের আক্রমণ করে – তাহলে আমরা কি-ই বা করতে পারি? আমরা এই এলাকা ছেড়ে যেতে বাধ্য হবো।”
>
> – পুরুষ, ৩০+, টেকনাফ

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স মিলিত ভাবে রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা এবং সেগুলো সংকলিত করার কাজ করছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিভাগগুলোকে রোহিঙ্গা এবং আশ্রয়দাতা (বাংলাদেশী) সম্প্রদায়ের থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া, যাতে তারা জনগোষ্ঠীগুলোর চাহিদা এবং পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি বিবেচনা করে ত্রাণের কাজ আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

এই কাজটির জন্য অর্থ সরবরাহ করেছে ই.ইউ হিউম্যানিটেরিয়ান এইড এবং ইউকে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট।

‘যা জানা জরুরি’ সম্পর্কে আপনার যেকোনো মন্তব্য, প্রশ্ন অথবা মতামত, info@cxbfeedback.org ঠিকানায় ইমেইল করে জানাতে পারেন।

এখানে প্রকাশিত বক্তব্যকে কোনোভাবেই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য হিসেবে, বা যুক্তরাজ্যের সরকারের সরকারি নীতি হিসেবে গণ্য করা উচিৎ নয়।